সারসংক্ষেপ

প্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন বন্য প্রদেশে বিভিন্ন আদিম জনজাতির নিবাস আছে। মূলত ভারতবর্ষের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর আদিবাসীরা বিশাল অংশ হলেও জনসংখ্যার অনুপাতের দিক থেকে সাঁওতাল আদিবাসী জনগোষ্ঠীর পরেই ওঁরাওদের স্থান। সমাজের বিভিন্ন স্তরে সাঁওতাল আদিবাসী জনজাতির পরিচয় থাকলেও ওঁরাও জনজাতির পরিচয় নেই বললেই চলে। ওঁরাওরা সমজে সাঁওতাল জনজাতি হিসাবে সকলের কাছে পরিচিত কিন্তু ওঁরাওরা সাঁওতালদের থেকে একেবারেই পৃথক একটা জনজাতি। প্রাচীনকালে বিশেষ করে সিন্ধু সভ্যতার সময়কালে প্রোটো অস্ট্রেলিয়ান প্রজাতির মুন্ডা, হো ও সাঁওতালদের পাশাপাশি দ্রাবিড় প্রজাতির ওঁরাও আদিম জনজাতির নিবাস ছিল। এস. সি. রায় এর মতে ওঁরাওদের পূর্বপুরুষরা দক্ষিন-পূর্ব এশিয়া থেকে ভরতে প্রবেশ করে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় বসতি গড়ে তুলেছে। বিশেষ করে ঝাড়খন্ড রাঁচি, আসাম এবং আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে বসতি গড়ে তুলেছে। ভারতবর্ষের বাইরেও নেপাল বাংলাদেশ মরিশাসে বসতি স্থাপন করে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে। ওঁরাওদের প্রধান জীবিকা ছিল কৃষিকাজ। ওঁরাওরা কঠোর পরিশ্রম করতে পারত। পুরুষদের সাথে মহিলারাও সমস্ত কাজে অংশগ্রহণ করত। তাদের নিজস্ব একটা ভাষা আছে, সেই ভাষাটি কুরুখ ভাষা হিসাবে পরিচিত। সমাজের প্রথমদিকে ওঁরাওরা কুরুখ ভাষাতে বেশি কথা বলত। এদের প্রধান উৎসব হল করম উৎসব। এই উৎসবের সময় কুরুখ ভাষায় নাচ গান অনুষ্ঠিত হয়। এই জনজাতির মধ্যে শিক্ষার হার ছিল খুবই নগন্য, ছেলেরা একটু শিক্ষিত হলেও মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার হার ছিল না বললেই চলে। ওঁরাও সমাজে মেয়েদের কমবয়সে বিয়ে হয়ে যেত। বিবাহের ক্ষেত্রে বিশেষ ধরনের রীতি প্রচলিত

আছে যা অন্য আদিম জনজাতির থেকে একেবারেই পৃথক। এই জনজাতির মধ্যেই এদের বিবাহ হয়ে থাকে। তবে এদের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রথা নেই, বিধবা-বিবাহ বা সাঙা হয়। স্বাধীনতার পর থেকে ওঁরাও জনজাতির মধ্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে উন্নয়ন হলেও অন্যান্য আদিম জনজাতির থেকে তারা এখনও অনেকটাই পিছিয়ে।

যাদের অনেকে আজও আধুনিক বিজ্ঞান প্রযুক্তি নির্ভর সভ্যতার বাইরে প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে আছে, এই রকমই ভারতবর্ষের এক আদিম জনজাতি হল ওঁরাও। ভারতবর্ষের অন্যান্য জনজাতির মতো ওঁরাও জনজতির মানুষেরা মানভুম জেলায় দীর্ঘদিন প্রকৃতি নির্ভর এক আলাদা সমাজ কাঠামোকে বজায় রেখেছিল। কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের বিভিন্ন নিয়মনীতি, খ্রিষ্টান মিশনারীদের কার্যকলাপ, অভিপ্রয়াণ, আন্দোলন অধিকার প্রাপ্তি প্রভৃতি কার্যকলাপে ওঁরাও সমাজ-সংস্কৃতি ও পরিবেশের ক্ষেত্রে যে বিবর্তনের ধারা শুরু হয়েছিল স্বাধীনতা পরবর্তী কালেও সেই ধারা বজায় ছিল। স্বাধীন ভারতের সংবিধানের সংরক্ষণ নীতি, ভোটাধিকার প্রয়োগ, নতুন অর্থনীতি, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, এবং তলং সিকি লিপির প্রচলন ওঁরাও সমাজ-সংস্কৃতি ও প্রাকৃতিক পরিমন্ডলকে বিবর্তনের নতুন ধারায় প্রভাবিত করে এক নতুন সংকট এর উদ্ভব ঘটায়। যা ওঁরাওদের এক স্বতন্ত্র পরিচিতি কে নির্দিষ্ট অবয়বের মধ্যে ঠেলে দেয়, যা ওঁরাও জনজাতির স্বার্থের পরিপন্থী।

ওঁরাও জনজাতির ইতিহাস সেই সুদূর প্রাচীন ভারতের মধ্যে নিহিত রয়েছে। আদিম জনজাতি গুলির মধ্যে, ওঁরাওদের স্থান অন্যতম। তাম্র-প্রস্তর যুগের সিন্ধু সভ্যতার সময়েও এদের অস্তিত্বের কথা জানা যায়। প্রাচীন বৈদিক সাহিত্য, পুরাণ, মৌর্য এবং মৌর্যোত্তর, গুপ্ত এবং গুপ্তোত্তর সময়ে বারংবার এই জনজাতির কথা উল্লিখিত হয়েছে। সুলতানি ও মোঘল আমলে, ভারতে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত

হওয়ার পরেও, এই জনজাতির মানুষদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায়ের নানাবিধ পরিকল্পনার কথা জানা যায়। তবে আমার এই গবেষণায় প্রাক্-ঔপনিবেশিক পর্বের ওঁরাও জনজাতির কথা সেইভাবে উল্লিখিত হবে না। ওঁরাও জনজাতির মানুষরা প্রাথমিক পর্বে দক্ষিণ ভারতে বসবাস করত। বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণে এবং কৃষ্ণা নদীর উত্তরের মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ উর্বর কৃষি জমিগুলিতে এরা বসবাস করত। পরবর্তী পর্যায়ে রাজনৈতিক প্রতিকূলতা, বহিঃশত্রুর আক্রমন, খাদ্যাভাব প্রভৃতি কারণে এদের একটা অংশ উত্তর ভারতে চলে এসেছিল। প্রাক্-ঔপনিবেশিক পর্বে, বিশেষ ভাবে মোঘল আমলে রাজকর্মচারির অত্যাচার এবং রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষেত্রে অত্যধিক বাড়াবাড়ির ফল স্বরূপ, এরা ছোটোনাগপুর অঞ্চলের জঙ্গলাকীর্ণ অনুর্বর জমিগুলিতে স্থায়ী ভাবে বসবাস শুরু করেছিল। কারণ এই অঞ্চলের জমিগুলি অনুর্বর হওয়ায়, মোঘল বাদশাহরা স্থানটিকে নিয়ে খুব বেশি চিন্তিত ছিলেন না। ওঁরাও জনজাতির মানুষ কঠোর পরিশ্রম করে এই স্থানটিকে বসবাসের যোগ্য করে তুলেছিল। সুপ্রাচীন কাল থেকে ওঁরাও জনজাতির মানুষদের একটা পৃথক জীবনধারা ও সংস্কৃতি টিকে ছিল। সর্বভারতীয় স্তরে সম্রাট বা রাজার পরিবর্তন ঘটলেও, ওঁরাও জনজাতির মানুষদের সেইভাবে তা প্রভাবিত করতে পারে নি। এমনকি, বৈদেশিক আক্রমণ ঘটলেও তারা নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। তবে বাংলা তথা ভারতে ক্রমপর্যায়ে ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে, অবস্থার পরিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়েছিল। ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ, সমস্ত জমি ও জনসাধারণের উপর শোষণ ও শাসন চালিয়ে তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে চেয়েছিল। পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ওঁরাও তথা অন্যান্য আদিবাসী জনজাতির সমাজেও বেশ কিছু পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। প্রথমত, এই জনজাতির মানুষরা পৃথক ভাবে বিচ্ছিন্ন থাকার অধিকার

হারিয়েছিল। কারণ আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল গুলিতে ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, ঐসব অঞ্চলে সাধারণ উচ্চ বর্ণের মানুষের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ফলে তাদের স্বশাসনের অধিকার ক্রমশ লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। তৃতীয়ত, খ্রিষ্টান মিশনারিগুলির ধর্ম প্রচারের ফলে তাদের প্রাচীন সংস্কৃতি ও ধর্ম বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। চতুর্থত, পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে মুষ্টিমেয় কয়েকজন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রচেষ্টায় সাঁওতাল, মুন্ডা, ওঁরাও ও অন্যান্য জনজাতির মানুষ রাজনৈতিক ভাবে সচেতন হয়ে উঠেছিল।

সমস্ত আদিবাসী জনজাতির ইতিহাস বিশ্লেষণ করার অবকাশ আমার নেই। এই গবেষণায় আমি শুধু ওঁরাও জনজাতির মানুষদের সমাজ-সংস্কৃতি, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় ইতিহাস অনুসন্ধান করার প্রয়াস করব। আবার এই গবেষণা শুধু ঔপনিবেশিক ও ঔপনিবেশিকোত্তর পর্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। ঔপনিবেশিক আমলে সাঁওতাল, কোল, ভিল, মুণ্ডা, ওঁরাও প্রভুতি জনজাতির প্রধান বসতি ছিল মানভুম জেলায়। যা বর্তমান পশ্চিম বঙ্গের পুরুলিয়া জেলার অন্তর্গত। যদিও স্বাধীনতা পর্বে এই জেলা বিহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। পরবর্তি পর্যায়ে তা পশ্চিম বঙ্গের সাথে যুক্ত হয়েছিল। তবে মনে রাখতে হবে যে, একদা মানভূম জেলা নামে পরিচিত স্থানটি আজ পুরুলিয়া জেলা নামে খ্যাত। পুরুলিয়া জেলার প্রাচীন ইতিহাস সঠিক ভাবে জানা যায় না। তবে কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান থেকে তার একটা আনুমানিক তথ্য জানা যায় মাত্র। মধ্য যুগেও এই স্থানটির ইতিহাস সেইভাবে কোথাও উল্লিখিত হয়নি। আসলে এই স্থানটি সেইসময় ছিল জঙ্গলাকীর্ণ। ফলে এই অঞ্চলে কৃষির প্রসার সেইভাবে ঘটেনি। এই অঞ্চল থেকে রাজস্ব আদায়ের সুযোগও ছিল না। তাই হয়তো সুলতানি শাসক ও মোঘল বাদসাহরা এই স্থানটির দিকে সেইভাবে গুরুত্ব দেননি। তবে বাংলায়

কোম্পানীর শাসনকালে ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হলে, নতুন ভূস্বামি ও জমিদার শ্রেণী রাজস্ব আদায়ের হার বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অন্যান্য স্থানের ন্যায় এই স্থানটিতে জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করে আবাদি কৃষি জমির পরিমান বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। ফলে অষ্টাদশ শতকের শেষের দিক থেকে বহিরাগত হিন্দু মধ্যবিত্ত জমিদার শ্রেণী এই অঞ্চলে স্থায়ী ভাবে বসবাস করতে শুরু করেছিল। পাশাপাশি বেশ কিছু খ্রিষ্টান মিশনারি খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে এই অঞ্চলের নিরক্ষর আদিবাসী সমাজের মধ্যে ধর্ম প্রচার শুরু করেছিল। প্রচলিত হিন্দু সমাজে উপেক্ষিত এইসব আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষদেরকে খ্রীষ্টান মিশনারিগুলি সহজেই আকৃষ্ট করতে পেরেছিল। তবে পরিবর্তিত নতুন আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় বাতাবরণে ঐসব আদিবাসী সমাজের মানুষ কখনই নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারেনি। ফলে তাদের মধ্যে সর্বদা একটা বিদ্রোহের চাপা উত্তেজনা চোরা শ্রোতের মত বয়ে যাচ্ছিল। ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এইখানকার স্থানীয় জনজাতিদের ব্রিটিশ বিরোধী কার্যকলাপ, পুরুলিয়ার গুরুত্ব সর্বসমক্ষে তুলে ধরেছিল। ঊনবিংশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে ছোটো-বড়ো নানা বিদ্রোহে তারা সামিল হয়েছিল। হিন্দু সমাজের নিম্ন শ্রেণী ঐসব আদিবাসী বিদ্রোহে স্বতস্ফূর্ত ভাবে সামিল হয়েছিল। ব্রিটিশ বিরোধী সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওঁরাও প্রভৃতি বিদ্রোহে এই পুরুলিয়ার আদিবাসীরা তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। এইখানকার আদিবাসীদের মধ্যে সংখ্যাধিক্য ছিল সাঁওতালরা। তারপরেই যথাক্রমে ওঁরাও ও মুণ্ডাদের স্থান। ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তথা স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্রে এইসব আদিবাসী বিদ্রোহের গুরুত্বকে কখনই অস্বীকার করা যায় না। শুধু তাই নয়; ঔপনিবেশিক আমলে এবং ঔপনিবেশিকোত্তর পর্যায়ে ভাষার ভিত্তিতে পৃথক পুরুলিয়া জেলা গঠনের দাবীতে

স্থানীয়রা বারংবার সোচ্চার হয়েছিল। পুরুলিয়া জেলার সাধারণ বাঙালি ও আদিবাসী মানুষদের উপর বলপূর্বক হিন্দি ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা করা হয়েছিল। ফলে আদিবাসী সাঁওতাল ও ওঁরাওদের পাশাপাশি, এক বিরাট সংখ্যক বাঙালি মানুষ পৃথক পুরুলিয়া জেলা গঠনের জন্য প্রত্যক্ষ আন্দোলনে সামিল হয়েছিল। তবে আদিবাসীদের সেই ভাষা আন্দোলনের পথ খুব সহজ ছিল না। ১৯৪০-এর দশকের শেষের দিকে ভাষার ভিত্তিতে দেশের অন্যান্য প্রান্তের ন্যায়, ঝাড়খণ্ডেও ভাষার ভিত্তিতে পৃথক আদিবাসী রাজ্য গঠনের দাবী তোলা হয়েছিল। সক্রিয় আন্দোলনের ফলে অবশেষে ১৯৫৬ সালে পুরুলিয়া জেলা গড়ে উঠেছিল। তবে আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি নিয়ে পৃথক রাজ্য গঠনের দাবীতে তৎকালীন বিহারের ছোটোনাগপুর অঞ্চলে বারংবার সাধারণ মানুষ সোচ্চার হয়েছিল। ১৯৯০-এর দশকে এই আন্দোলন আইনি পর্যায়ে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গড়িয়েছিল। বিভিন্ন মামলা-মকদ্দমা এবং শুনানির পর ১৯৯৯ সালে ভারতের সংসদে আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে পৃথক রাজ্য গঠনের বিষয়ে একটি বিল পাস হয়েছিল। তারই ফল স্বরূপ ঐ বছরেই বিহারের একটা অংশ নিয়ে ঝাড়খণ্ড নামে নুতন একটি আদিবাসী রাজ্য আত্মপ্রকাশ করেছিল। যদিও আদিবাসীদের জন্য পৃথক একটি রাজ্য গঠনের ফলে আদিবাসীদের কতখানি সুবিধা হয়েছে, তা একটি আজও বিতর্কিত এবং অমীমাংসিত বিষয়।

গবেষণার উদ্দেশ্য

মানভুম জেলায় ওঁরাওদের গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন, ঐতিহ্যবাহী সমাজ, অর্থনীতি, প্রশাসন এবং সংস্কৃতি তাদের মধ্যে এক আলাদা জাতিগত পরিচিতি তৈরি করেছিল। ব্রিটিশ শাসনকালে সরকারি নীতি নির্ধারণ ফলে ওঁরাও জনজাতির আর্থসামাজিক, সাংস্কৃতিক ও

ধর্মীয় জীবনে নানা সমস্যা দেখা দেয়। ব্রিটিশ সরকারের বিভিন্ন বন আইনের জন্য ওঁরাওদের জীবনে অন্ধকার নেমে আসে। আবার স্বাধীন ভারতবর্ষে পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু ও অন্যান্য নেতাদের অনগ্রসর উন্নয়নের প্রচেষ্টা তথা ভারতীয় অগ্রসর সমাজের সঙ্গে একত্র করার প্রচেষ্টা ওঁরাও জনজাতির সমাজ ব্যবস্থায় এক নতুন সংকটের সৃষ্টি করে। তাই সময়ের ও প্রকৃতির পরিবর্তনের সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে ওঁরাও সমাজের গঠন, রীতিনীতি, ধর্ম, অর্থনীতি, সংস্কৃতি,শিক্ষা এমনকি ওঁরাওদের অভিরুচি, চাহিদা, চিন্তা-ভাবনা, এবং মানসিকতার যে পরিবর্তন ঘটেছিল এবং ভারতীয় ইতিহাসে, সাহিত্য, ও সমাজ দর্পণে সাঁওতাল জনজাতির যে ভাবে চর্চা বা আলোচনা পাওয়া যায়, সেই দিক দিয়ে এই ওঁরাও জনজাতি সম্পর্কিত চর্চা বা আলোচনার অপ্রতুলতা রয়ে গিয়েছে। ফলত অনেকেই ওঁরাও জনজাতিদের, সাঁওতালদের সঙ্গে একাত্ম করে বা সাঁওতাল হিসাবেই বিচার করেছেন। অথচ ওঁরাও জনজাতির সাঁওতাল জনজাতির মতই নিজস্ব ভাষা, লিপি, আচার-অনুষ্ঠান, বিবাহ রীতিনীতি, ও ধর্ম আছে। এই ওঁরাও জনজাতি যে সাঁওতাল জনজাতির থেকে পৃথক একটা জনজাতি তা তুলে ধরাই আমার গবেষণার মূল উদ্দেশ্য। স্বাধীনতা পরবর্তী কালে এদের অস্তিত্বের প্রকৃত পরিচিতি সম্পর্কেও আমি অনুসন্ধান করছি। প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে তাদের জীবনযাত্রার কথা ভাবাই যায় না। আজকের দিনে, যখন পরিবেশ প্রায় বিপন্ন, তখন এইসকল পরিবেশ ভাবনা ও প্রকৃতির সাথে একাত্ম হয়ে থাকার প্রবণতা, তাও তুলে ধরা যাতে আমার এই গবেষণাপত্রটি পরিবেশবিদদের কাছে ও সমাজের কাছে সচেতনতার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। মানভূম জেলায় স্থানান্তরিত ওঁরাও জনজাতির সমাজ, ধর্ম, সংস্কৃতি ও জীবন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, একটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠির ইতিহাস খোঁজার একটা প্রয়াস করেছি ফলে, প্রান্তিক ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রেও, এই গবেষনাপত্রটি গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।

গবেষণার গুরুত্ব

স্বাধীনতার পরবর্তী সময়কাল থেকে একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত সময়কালে মানভূম জেলায় ওঁরাও জনজাতির সমাজ সংস্কৃতিতে ব্রিটিশ সরকার, মিশনারী এবং স্বাধীন ভারতের সাংবিধানিক অধিকার, নেহরুর বিভিন্ন পরিকল্পনা যে বিবর্তনের ধারা শুরু করেছিল তা এখনও অনালোচিত আছে। বর্তমান গবেষণায় এই বিষয়টিকে তুলে ধরে ওঁরাওদের সামাজিক , সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনে কী ধরনের বিবর্তন ও সংকটের সৃষ্টি হয়েছিল তা আলোচনা করাই আমার গবেষণা কর্মের মূল তাৎপর্য বা গুরুত্ব।

গবেষণার ক্ষেত্র

আমি আমার গবেষণার এলাকা হিসাবে মানভূম জেলাকে বেছে নিয়েছি। ব্রিটিশ আমল থেকেই প্রশাসনিক কাজে সুবিধার জন্য মানভূমসহ ২৩ টি পরগনা ও মহল নিয়ে গঠিত হয়েছিল জঙ্গলমহল জেলা। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে ব্রিটিশ সরকার ১৮৩৩ সালে এই জেলা ভেঙে মানভূম জেলা গঠন করে। এই জেলার সদর দপ্তর হয়েছিল মানবাজার। বর্তমান বর্ধমান ও বাঁকুড়া জেলার বিশাল অংশ সেই সময় মানভূম জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯১১ সালে মানভূম জেলা বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিহার প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিল এবং স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত বিহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্তই ছিল। ১৯১২ সালে মানভূমে ভাষা আন্দোলন শুরু হয়েছিল। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৬ সালের মধ্যে এই ভাষা আন্দোলন তীব্র রূপ ধারণ করেছিল। এই ভাষা আন্দোলন পৃথিবীর দীর্ঘতম ভাষা আন্দোলন। এই ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে মানভূম জেলা একটি নতুন জেলা হিসাবে পুরুলিয়া জেলাকে সংযুক্ত করা হয়েছিল মেদিনীপুর বিভাগের পাঁচটি জেলার অন্যতম জেলা পুরুলিয়া। এই জেলা পশ্চিমবঙ্গের সর্ব পশ্চিমে অবস্থিত। দক্ষিণে ২২°৪৩' উত্তর

অক্ষাংশ থেকে ২৩°৪২' উত্তর অক্ষাংশ এবং পশ্চিমে ৮৫°৪৯' পূর্ণ দ্রাঘিমাংশ থেকে পূর্বে৮৬°৫৪' পূর্ব দ্রাঘিমাংশ এর মধ্যে অবস্থিত। মোট ভৌগলিক আয়তন ৬২৫৯বর্গ কিলোমিটার। জেলার সদর দপ্তর পুরুলিয়া ২৩°২০' উত্তর অক্ষাংশ ও ৮৭°৫১' পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। জেলার উত্তর পশ্চিমে ঝাড়খন্ড রাজ্য উত্তর পূর্বে বর্ধমান জেলা, পূর্বে বাঁকুড়া ও দক্ষিণ পূর্বে ঝাড়গ্রাম জেলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে।এই ভৌগলিক অবস্থানের মধ্যে ওঁরাও জনজাতির জীবন ধারায় নিজস্ব সংস্কৃতি ও পরিবেশ চেতনা লক্ষ্য করা যায়।

সাহিত্য পুনঃসমীক্ষা

ওঁরাওদের বিষয়ে চর্চার কাজ শুরু করেছিলেন খ্রিষ্টান মিশনারীরা এবং কিছু ব্রিটিশ প্রশাসক ও জাতিতত্ত্ববিদ। এর পর স্বাধীনতার পরবর্তী কালে ব্যাপকভাবে ওঁরাওদের বিষয়ে চর্চা শুরু হয়। তবে প্রাথমিক ভাবে ওঁরাওদের বিষয়ে চর্চা করা হত নৃতাত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে। ওঁরাওদের জনজীবন সম্পর্কে সামগ্রিক ভাবে চর্চা শুরু হয়েছিল বিংশ শতকের শেষের দু-দশকে। জাতিতত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে ওঁরাওদের বিষয়ে চর্চা করেছেন- ই.টি.ডালটন, এইচ.এইচ.রিজলে, ই.জি.ম্যান, ডব্লিউ.জি.আর্চার প্রমুখ ঔপনিবেশিক জাতিতত্ত্ববিদ ও প্রশাসক। আর ভারতীয় লেখকদের মধ্যে,আনন্দ কুমার দাস, ডি এন মাজুমদার, কে পি চট্টোপাধ্যায়, বি মুখার্জী এবং শরৎচন্দ্র রায় এ বিষয়ে চর্চা করেছেন। মিশনারীরা ও যাজকরা ওঁরাওদের ভাষা শিখে তাদের সঙ্গে মিশে ওঁরাওদের বিষয়ে বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেছেন। মিশনারীরা ওঁরাওদের জন্য শিক্ষা, তাদের স্বাস্থ্য চেতনা এবং তাদের আর্থিক বিকাশের জন্য প্রচুর কাজ করেছেন। বিখ্যাত মিশনারীরা হলেন - পি.ও.বোর্ডিং, এল.ও.স্ক্রেফসরুড, ডাব্লিউ জে.কালশো, জে.ফিলিপস্, ই.এল. পুক্রলি, এ.ক্যাম্পবেল, যে হপম্যান প্রমুখ। তারা সংস্কৃতি, সমাজ জীবন, ও

অর্থনীতি বিষয়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিবেশন করেছেন। অনেক গবেষক ওঁরাওদের সমাজ ও সংস্কৃতির বিবর্তনের বিষয়ে চর্চা করেছেন। তাঁরা দেখিয়েছেন কি ভাবে আধুনিকতা এবং বাণিজ্যিকীকরণ ওঁরাও সমাজের পরিবর্তন ঘটিয়েছে। এ বিষয়ে যারা গবেষনা করেছেন তারা হলেন শরৎচন্দ্র রায়, সন্তোষ রানা, কুমার রানা,অভীক ঘোষ ,দিয়াঙ্কার মিঞ্জি, গৌরাঙ্গ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ কুমার দাস,জিতু ওঁরাও প্রমুখ। শরৎচন্দ্র রায় এর লেখা “The Oraon of Chotonagpur” এবং “Oraons Religion and Customs” ডি. এক্কা এর লেখা “Education and Culture of Indigenous people of Chotonagpur” এ. ঘোষ এর লেখা “The World of Oraons”আর ও.ধন এর লেখা “These are my Tribesmen : The Oraons” এ. কূজূর এর “The Oraon Habitat: A Study in Cultural Geography” এই গ্রন্থগুলিতে ওঁরাওদের উৎপত্তি, অভিপ্রয়াণ, জনসংখ্যা, তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন, শ্রম বিভাজন, প্রশাসন ব্যবস্থা, বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠান, ধর্মবিশ্বাস, ডাইনি প্রথা, তাদের যৌনজীবন সম্পর্কে বিশদে বিবরন দিয়েছেন এবং সভ্যতার বিবর্তনের সঙ্গে ওঁরাও জনজীবনের পরিবর্তন দেখিয়েছেন। জে. কুজুর তাঁর “Indigenous People of India Problems and Prospects” গ্রন্থে দেখানোর চেষ্টা করেছেন কিভাবে দক্ষিন-পশ্চিম বাংলার ওঁরাওদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ের বিবর্তন ঘটেছে। তিনি দেখিয়েছেন কিভাবে সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিকতার অভিঘাতে ওঁরাওদের মনোজগৎ এবং বস্তুগত জগতের পরিবর্তন এসেছে। মানভুম জেলা গঠন থেকে নেহেরু যুগ পর্যন্ত মানভুমে ওঁরাওদের সামাজিক ও সংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে ধারাবাহিক পরিবর্তন গুলি সূচিত হয়েছে, সে বিষয়ে গবেষণা মূলক তেমন কোন কাজ হয়নি। তাছাড়া এই পরিবর্তন ওঁরাওরা স্বেচ্ছায় মেনে নিয়েছিল, না পরিস্থিতির চাপে বাধ্য হয়েছিল সে

বিষয়ে আলোকপাত করা হয়নি। আর এই পরিবর্তন গুলি ওঁরাওদের পরিচিতির সংকটকে কতটা গভীরতর করে তুলেছিল, তা আমি আমার গবেষণার মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করেছি। এমনকি ওঁরাও জনজাতি সাঁওতাল জনজাতির থেকে পৃথক একটা জনজাতি গবেষণায়, সেটিও তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

গবেষণায় উত্থাপিত প্রশ্ন

আমার গবেষণার মাধ্যমে নিম্ন লিখিত প্রশ্ন গুলির উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছি।

১) মানভুম জেলার মধ্যে কীভাবে ওঁরাও সমাজ ও সংস্কৃতির গতিময়তার পরিবর্তন ঘটল?

২) ওঁরাও সমাজ ও সংস্কৃতির পরিবর্তন যদি ঘটে থাকে তবে তা কোন কোন ক্ষেত্রে ঘটেছে?

৩) তলং সিকি হরফের আবিষ্কার কীভাবে জাতি চেতনাকে জাগ্রত করেছিল?

৪) স্বাধীন ভারতবর্ষের ওঁরাওদের প্রগতির প্রচেষ্টা গুলো কতটা বাস্তবায়িত হয়েছিল?

৫) পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ওঁরাও সমাজ ও সংস্কৃতিতে কি ধরণের প্রভাব এসেছিল?

৬) স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ধর্ম ও শিক্ষার ক্ষেত্রে কতটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে?

গবেষণার পদ্ধতি

ওঁরাও জনজাতি নিয়ে গবেষণা সাধারণ ইতিহাস রচনার চেয়ে একটু হলেও আলাদা। এক্ষেত্রে গবেষণার জন্য কবিতা,গান প্রভৃতি ব্যবহার করার চেষ্টা করেছি। আকর তথ্য

উপাদানের মধ্যে রয়েছে লেখাগারে সঞ্চিত বিভিন্ন সরকারী দলিল-দস্তাবেজ ও পর্যবেক্ষণ রিপোর্ট। বিভিন্ন কমিটির রিপোর্ট ও মিশনারীদের লেখা গ্রন্থ বা বিবরণও সহায়ক উপাদানের মধ্যে রয়েছে ।ওঁরাও জনজাতি বিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা এবং জার্নাল। এক্ষেত্রে পরিসংখ্যান ও গুনগত উভয় ধরনের তথ্য ব্যবহার করেছি। এর সঙ্গে যুক্ত করা সংগত হবে অধুনা গৃহীত উপাদান হিসাবে Oral Evidence। এটি নৃতত্ত্ব বিদ্যায় 'Participants Observation' হিসেবে পরিচিত। এছাড়াও আমি কুরুখ ভাষা ও তলং সিকি লিপি জানার সুবাদে বর্তমানে কুরুখ ভাষা ও তলং সিকি লিপিতে লিখিত গ্রন্থ থেকে এবং সাক্ষাৎকারের মাধ্যমেও তথ্য নেওয়ার চেষ্টা করেছি।

অধ্যায় বিভাজন

আমি আমার গবেষণার বিষয়টি আলোচনার সুবিধার জন্য চারটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে ভূমিকা ও উপসংহারের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর কথা ভাবা হয়েছে। এরই সঙ্গে গবেষণা কে পূর্ন্যতা দানের জন্যে ইতিহাসের আলোচনার পাশাপাশি নৃতাত্বিক ও সমাজতত্বাত্তিক বিষয় গুলি যুক্ত হয়েছে।

ভূমিকা :

প্রথম অধ্যায় : ওঁরাও জনজাতির ঐতিহাসিক ও সামাজিক পটভূমি।

দ্বিতীয় অধ্যায় : ওঁরাও জনজাতির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকট।

তৃতীয় অধ্যায় : ওঁরাও জনজাতির সমাজ সংস্কৃতি ও পরিবেশ ভাবনা।

চতুর্থ অধ্যায় : ওঁরাও জনজাতির ধর্মীয় জীবন।

উপসংহার :

প্রাচীন বৈদিক আর্য সভ্যতার সময় থেকে, আর্য-অনার্য বিরোধ শুরু হয়েছিল। ঔপনিবেশিক শাসনকালে, 'আর্য' ধারণার সাথে বর্ণ-বৈষম্যের ধারনা যুক্ত হয়ে যাওয়ার

ফলে, নতুন ভাবে সেই বিতর্ককে উস্কে দেওয়া হয়েছিল। সমস্ত বিতর্ক ও বিরোধ সত্ত্বেও, একথা নিশ্চিত যে, জনজাতির মানুষ দীর্ঘ দিন ধরে ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে বসবাস করে আসছে। বিদেশি আক্রমণ, মিশ্র সংস্কৃতির প্রভাব প্রভৃতি সত্ত্বেও, এই আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ নিজেদের সংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকার চেষ্টা করেছে। কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তীকালে, ভারতীয় সংবিধানে এদের জনজাতি হিসাবে চিন্হিত করা হয়েছে। তবে, সমস্ত আদিবাসী মানুষকে একক দৃষ্টিভঙ্গিতে সাধারণীকরণের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা কখনই সমীচীন নয়। সাঁওতাল, ওঁরাও, মুণ্ডা, কোল, ভিল সহ বহু আদিবাসী মানুষের বসবাস এই ভারতবর্ষে। প্রতিটি জনজাতির গোষ্ঠীর মধ্যে যেমন নানাবিধ সাদৃশ্য রয়েছে, তেমনই তাদের মধ্যে বৈষম্যও কম নয়। প্রতিটি আদিবাসী বা জনজাতির মানুষদের জীবনযাত্রা, জীবন শৈলী, পেশা, সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন স্বাভাবিক নিয়মেই, সময়ের সাথেসাথে পালটে গেছে। বিস্তীর্ণ ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে গড়ে উঠেছে, বিভিন্ন আদিবাসী মানুষদের পৃথক সংস্কৃতি। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে, ঔপনিবেশিক-উত্তর সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতিতে রূপান্তরের সাথেসাথে; জনজাতির মানুষদের মধ্যেও নানা পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। এই সন্দর্ভে মূলত ওঁরাও জনজাতির মানুষদের সমাজ, সংস্কৃতি ও জীবন সংগ্রামের কথা অনুসন্ধান করে দেখার একটা প্রয়াস রয়েছে। স্বাধীনতা পরবর্তী পর্যায় থেকে একবিংশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত সময়সীমাকে ধরে, এই অনুসন্ধান করা হয়েছে।

সুতরাং, ওঁরাও জনজাতির মানুষদের সাথে অপরাপর জনজাতির মানুষদের যেমন বেশ কিছু ক্ষেত্রে সাদৃশ্য রয়েছে, তেমনই এই জনজাতির নিজস্ব কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। আর সেই জন্যই, ইতিহাসে, এই জনজাতির একটা নিজস্ব সামাজিক প্রথা ও সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। সন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে, ওঁরাও জনজাতির

ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটটি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সুপ্রাচীনকাল থেকে ওঁরাও জনজাতির মানুষ, মূলত জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলগুলিতে বসবাস করত। প্রকৃতির সাথে তাদের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত নিবিড়। প্রাক্-ঔপনিবেশিক পর্বে সেই ঐতিহ্য মেনেই তারা দীর্ঘদিন ধরে, বসবাস করে আসছিল। কিন্তু, ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর; সেই প্রথাগত জীবনধারায়, বেশ কিছু মৌলিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়েছিল। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর, কৃষির বাণীজ্যিকীকরণ করা হয়েছিল। ফলে, প্রচলিত কৃষি নির্ভর অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়েছিল। আবার, ১৮৬০এর দশকে বন-আইন পাশ এবং পৃথক বন-দপ্তর প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে, ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ, জঙ্গলের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করেছিল। ফলে জঙ্গলে বসবাসকারী আদিবাসী মানুষদের উপর এক বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল। জঙ্গলে অবাধ প্রবেশের উপর নানা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল। জীবন ও জীবিকার তাগিদে জঙ্গলের উপর নির্ভরশীল, আআদিবাসী মানুষদের নতুন স্থান অনুসন্ধান করতে হয়েছিল। ওঁরাও জনজাতির মানুষদের ক্ষেত্রেও, তার ব্যতিক্রম হয়নি। ফলে ওঁরাও জনজাতির মানুষ, নিরিবিলি এবং নিরবিচ্ছিন্ন স্থান অনুসন্ধানের খোঁজে, নতুন জায়গায় স্থানান্তরিত হয়েছিল। এই ভাবে আধুনিক পর্বেই, ওঁরাও জনজাতির মানুষদের অভিবাসন ঘটেছিল। এই অধ্যায়ে মানভূম জেলার ওঁরাও জনজাতির পূর্ববর্তী বাসস্থান এবং সেখান থেকে তাদের চলে আসার ইতিহাসও তুলে ধরা হয়েছে।

ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে, ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বারংবার আদিবাসী বিদ্রোহের ফলে, কোম্পানির কর্তৃপক্ষ, ব্যতিব্যস্ত হয়েছিল। এই আদিবাসী বিদ্রোহগুলির মধ্যে যেমন নিজস্ব সমাজ, সংস্কৃতি জীবন ও জীবিকাকে টিকিয়ে রাখার আকাঙ্ক্ষা

যেমন কাজ করেছিল, তেমনই তাতে জনজাতির মানুষদের ঐক্যবোধ প্রতিফলিত হয়েছিল। তবে,এই প্রবন্ধে ওঁরাও জনজাতির সাথে অন্যান্য জনজাতির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মূল ফারাকগুলি তুলে ধরার একটা প্রয়াস করা হয়েছে। মূলত, সাঁওতাল, মুণ্ডা, কোল উপজাতির সাথে, ওঁরাও জনজাতির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগুলি গুরুত্ব সহকারে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। রেল পথের বিস্তার, চা-বাগিচা শিল্পের প্রসার প্রভৃতি ক্ষেত্রে, জনজাতির মানুষেরা যুক্ত হতে বাধ্য হয়েছিল। পশু শিকার ও বনজ সম্পদ সংগ্রহ করে বেঁচে থাকার কোনো উপায় না দেখে, তারা তথাকথিত আধুনিক শিল্পগুলিতে শ্রমিক হিসাবে যোগদান করেছিল। ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ, মহাবিদ্রোহের পর, সাঁওতাল, ওঁরাও, কোল, ভিল প্রভৃতি জনজাতির মানুষদের পৃথক করে রাখার নীতি গ্রহণ করেছিল। সাঁওতাল পরগণা নামে পৃথক একটি প্রশাসনিক কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছিল। এতদ্ সত্ত্বেও, গান্ধীবাদি রাজনীতিতে অনেক সংখ্যক জনজাতির মানুষ যোগদান করেছিল। গান্ধীজির ‘হরিজন আন্দোলন’-এর পাশাপাশি, আম্বেদকরের নেতৃত্বে শুরু হয়েছিল; তপসিলি জাতি ও উপজাতির অধিকার রক্ষার আন্দোলন। সুতরাং, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মূল শ্রোত থেকে ভারতের জনজাতির মানুষ কখনই বিচ্ছিন্ন ছিল না।

স্বাধীনতা পরবর্তী পর্যায়ে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে, জনজাতির মানুষের জীবনে পরিবর্তন লক্ষ করা গিয়েছিল। ওঁরাও জনজাতির মানুষদের ক্ষেত্রেও তার কোনো ব্যতিক্রম হয়নি। ওঁরাও জনজাতির মানুষদেরকে নতুন এক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। কৃষি ক্ষেত্রে তারা ভাগ চাষি এবং মজদুর হিসাবে যোগদান করতে বাধ্য হয়েছিল। আবার কোনোকোনো ক্ষেত্রে, ফসল বিক্রেতা হিসাবে জীবিকা গ্রহণ করে, পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে তারা খাপ খাইয়ে নেওয়ার চেষ্টা

করেছিল। অনেকে ‘মাহিন্দার’ বা গৃহকর্মে পরিচারক-পরিচারিকা হিসাবে কাজ করতে বাধ্য হয়েছিল। অর্থাৎ, ওঁরাও জনজাতির প্রচলিত জীবিকা পরিত্যাগ করে, সমাজের মূল স্রোতে টিকে থাকার চেষ্টা করেছিল। খুব স্বাভাবিক ভাবেই, ওঁরাও জনজাতির মানুষ কাজের সন্ধানে এক জায়গা থেকে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল। অর্থনৈতিক দুর্দশার জন্যই, এই সম্প্রদায়ের পুরুষদের মধ্যে ‘ঘর জামাই’-এর ধারনা, অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

রাজনৈতিক দিক থেকেও, ওঁরাও জনজাতির মানুষদেরকে অবহেলা করা হয়েছিল। বিভিন্ন পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায়, জনজাতি মানুষদের উন্নয়নকল্পে নানা গালভরা কথা বলা হলেও, তার কোনো বাস্তব রূপায়ন লক্ষ্য করা যায়নি। নির্বাচনে সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ না করা এবং নির্বাচিত হওয়ার অধিকার থেকে তারা উদাসীন থাকার ফলে, ক্ষমতাসীন সরকারের কাছেও তারা ছিল অপাঙ্কতেয়। সক্রিয় রাজনীতিতে নিরক্ষর ওঁরাও জনজাতির মানুষ, তেমন ভাবে নির্ণায়ক ভূমিকা নিতে পারেনি। যথাযথ শিক্ষার অভাবে, তারা নিজেদের আইনি অধিকার এবং সামাজিক অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার বিষয়েও, অজ্ঞ ছিল। বি. আর. আম্বেদকর যে ‘পঞ্চশীল’ নীতির কথা ভেবেছিলেন; তাকে জহরলাল নেহেরু প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন বাস্তবায়ন করার কথা বলেছিলেন। কিন্তু, শিক্ষার প্রসার ও জীবিকা গ্রহণের ক্ষেত্রে, ওঁরাওরা কোনো বিশেষ সুযোগ পায়নি। সমাজের মূল স্রোতে তারা একেবারেই ফিরতে পারেনি। স্বাধীনতা পরবর্তী পর্যায়ে, কংগ্রেস এবং অকংগ্রেস সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নেহেরুর পর, প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব অনেকেই সামলেছেন। কিন্তু, ওঁরাও সহ অপরাপর জনজাতির অবস্থার তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি। অত্যন্ত ধীরে হলেও কিছুসংখ্যক ওঁরাওরা ক্রমশ তাদের অবস্থা সম্পর্কে সচেতন হয়েছে । এর ফল স্বরূপ, ২০০৬ সালে

প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ‘কুরুখ লিটারারী সোসাইটি’ নামে, ওঁরাও জনজাতির একটি পৃথক সংগঠন। এই সংগঠন মূলত, ওঁরাও জনজাতির মানুষের শিক্ষা, জীবিকা, সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সামিল হওয়ার ডাক দিয়েছিল। অনেক ওঁরাও জনজাতির মানুষ আবার সাংবিধানিক অধিকার না পেয়ে, সন্ত্রাসের মাধ্যমে অগণতান্ত্রিক পথে নিজেদের অধিকার আদায়ের চেষ্টা করেছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে, ওঁরাও জনজাতির মানুষদের স্বাধীনতা পরবর্তী পর্যায়ে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে হতাশা ও তার দরুন তাদের নিজেদের একটি পৃথক সংগঠন গড়ে তোলার প্রেক্ষিত বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

গবেষণাপত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে, ওঁরাও জনজাতির সমাজ ও সংস্কৃতির বিষয়ে বিস্তর আলোচনা করা হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে ভ্রাম্যমান জীবনযাপনের পর, তারা স্থায়ী ভাবে বিভিন্ন প্রান্তে বসবাস করতে শুরু করেছিল। ঔপনিবেশিক-উত্তর যুগে, তাদের পৃথক সংস্কৃতি বজায় ছিল। এখানে মূলত, মানভূম জেলায় বসবাসরত ওঁরাও জনজাতির মানুষদের সামাজিক সংগঠন ও সমাজ ব্যবস্থার কথা আলোচিত হয়েছে। সংস্কৃতিক দিক থেকেও এই ওঁরাও জনজাতির মানষেরা, অন্যান্য জনজাতির থেকে ছিল পৃথক। ওঁরাওদের পৃথক ভাষা, ধর্ম, আচার-অনুষ্ঠান, সমাজ কাঠামো থাকা সত্ত্বেও, সাঁওতাল উপজাতির মানুষদের সাথে অনেক সময় তাদেরকে এক করে দেখা হয়। অথচ, সাঁওতালদের সংস্কৃতির সাথে, ওঁরাওদের বেশ কিছু বৈপরীত্য রয়েছে। উভয় সংস্কৃতির বেশ কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্রচলিত ধারনা ও ভাষ্যে, প্রায় সাঁওতাল, ওঁরাও, কোল, ভিল, মুণ্ডা প্রভৃতি উপজাতির মানুষদের একটি অবিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠী হিসাবে তুলে ধরার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে যদি ওঁরাও জনজাতির ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানগুলি পর্যালোচনা করা যায়; তাহলে সেই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগুলি আরো

স্পষ্ট ভাবে পরিস্ফুট হবে। বারো মাসে তের পার্বণ হিসাবে, ওঁরাও জনজাতির ; ‘করম’, ‘ফাগুয়া’, ‘টাটকা পরব’, ‘সহরাই’ সহ বিভিন্ন ধরনের পরব রয়েছে, যা তারা দীর্ঘদিন ধরে মেনে এবং উদজাপন করে আসছে। এছাড়া জন্ম, মৃত্যু এবং বিবাহকে কেন্দ্র করেও, পৃথক রীতিনীতি প্রচলিত রয়েছে।

‘ধুমকুড়িয়া’-র ধারনা হল ওঁরাও জনজাতির একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। ‘ধুমকুড়িয়া’ বলতে প্রকৃতপক্ষে একটি পবিত্র বাড়িকে বোঝান হয়। সুপ্রাচীনকাল কাল থেকে, এই ‘ধুমকুড়িয়া’ নামক প্রতিষ্ঠানে ওঁরাও জনজাতির অবিবাহিত ছেলে ও মেয়েদের প্রশিক্ষণ নেওয়ার রীতি প্রচলিত রয়েছে। শিক্ষা, জীবনশৈলী, ধর্মাচরণ প্রভৃতি শিক্ষা এখানে দেওয়া হয়। প্রচলিত বিদ্যালয়ের মতই, এই প্রতিষ্ঠানটি কাজ করে থাকে। তবে, এই প্রতিষ্ঠানটিকে, একটি পবিত্র ধর্মীয় স্থান হিসাবেও মনে করা হয়। প্রকৃতপক্ষে, ওঁরাও জনজাতির মানুষদের কোনো লিখিত ঐতিহাসিক উপাদান পাওয়া যায় না। বর্তমানে কুরুখ ভাষায় লেখা যৎসামান্য কিছু গ্রন্থ থেকে এইসব সামাজিক রীতিনীতির কথা জানা যায়। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সেই রীতিনীতিগুলি থেকেই,ওঁরাওদের বিষয়ে কিছুটা জানা যায়। এছাড়া, মৌখিক ভাষ্যের উপরেও খানিকটা নির্ভর করতে হয়। তবে, ওঁরাও জনজাতির মানুষের সাথে, প্রকৃতির একটা নিবিড় সংযোগ আগাগোড়াই গড়ে উঠেছে। প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে তাদের জীবনযাত্রার কথা ভাবাই যায় না। অন্যান্য জনজাতিগুলির মতই, ওঁরাওদের জীবনে, প্রকৃতি ও পরিবেশ ভাবনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেকোনো সামাজিক ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রকৃতিকে বাঁচিয়ে রাখা এবং পরিবেশের সাথে মানুষের সহাবস্থানের তাগিদ প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়। আজকের দিনে, যখন পরিবেশ প্রায় বিপন্ন, তখন এইসকল

পরিবেশ ভাবনা ও প্রকৃতির সাথে একাত্ম হয়ে থাকার প্রবণতা, সত্যই আমাদের কাছে একটি শিক্ষনীয় বিষয় হিসাবে বিবেচিত হতে পারে।

চতুর্থ অধ্যায়ে, ওঁরাও জনজাতির ধর্ম প্রসঙ্গে বিশদে আলোচনা করা হয়েছে। ওঁরাও জনজাতির মানুষ, পৃথক একটি ধর্মমত মেনে চলে। তাদের প্রধান দেবতা হলেন ধর্মেশ। এই ধর্মেশ হলেন মূলত সূর্য দেবতা। যা প্রকৃতির মূল শক্তির আধার। প্রচলিত হিন্দু ধর্মে যেমন গৃহ শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যেমন 'সত্য নারায়ন পুজা' করা হয়, তেমনই ওঁরাও জনজাতির মানুষ, 'ডাণ্ডা-কাট্টানা'-র পূজো করে থাকে। এমনকি সব রকমের শুদ্ধি করণের ক্ষেত্রে তারা এই পূজা এখনও করে থাকে। কিন্তু, ওঁরাওদের প্রচলিত ধর্মের উপর অপরাপর হিন্দু ধর্মমতের আধিপত্য বিস্তার বিভিন্ন সময় লক্ষ্য করা গেছে। আবার, অনেক ওঁরাও জনজাতির মানুষ হিন্দু ও খ্রীষ্টান ধর্মে দিক্ষা নিতে বাধ্য হয়েছে। দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে, নানা প্রলোভন দেখিয়ে, তাদের ধর্মান্তরিত করার প্রয়াস ঔপনিবেশিক আমল থেকেই শুরু হয়েছিল। ওঁরাও জনজাতির মানুষ মূলত 'সারনা ধর্ম'-এ বিশ্বাস করে। কিন্তু সরকারি জনগণনা, সমীক্ষা এবং যেকোনো পরিসংখ্যানে এই 'সারনা ধর্ম'-কে হিন্দু ধর্মের সাথে এক করে দেখা হয়েছে। ফলে, পরিকল্পিত ভাবে জনজাতির মানুষের প্রথাগত ধর্ম বিশ্বাসের উপর হিন্দু ধর্মের আধিপত্য বিস্তার লক্ষ্য করা গিয়েছে। অন্যান্য জনজাতির মানুষদের মতই, ওঁরাও জনজাতির মানুষেরা শিক্ষা ক্ষেত্রে যথেষ্ট পিছিয়ে রয়েছে। তাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য, সরকারী ভাবে তেমন কোনো গঠনমূলক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। কোনোরকমে যারা খানিকটা শিক্ষিত হয়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছে; তারা আবার নিজেদের স্বজাত্যবোধ ভুলে সমাজের মূল স্রোতে মেশার চেষ্টা করেছে। সেখানেও অবশ্য তারা প্রান্তিক হয়েই রয়ে গেছে। অর্থাৎ, ওঁরাও জনজাতির মানুষদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি হয়ে

গেছে। পুরানো সেই আত্মিক বন্ধন এবং স্বতন্ত্র সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখার তাগিদ, ওঁরাওদের মধ্যে অনেক কমে গেছে। স্বাধীনতা পরবর্তী পর্যায়ের এই পরিবর্তন, অন্যান্য জনজাতির মানুষদের মধ্যেও অবশ্য লক্ষ্য করা গেছে।

সুতরাং ওঁরাও জনজাতির মানুষদের সমাজ, ধর্ম, শিক্ষা, জীবিকা প্রভৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রেই বেশ কিছু স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। ওঁরাও জনজাতির সেই বিশেষ বৈশিষ্ট্য গুলির মধ্যেই তাদের প্রকৃত ইতিহাসকে খুঁজে বের করার একটা প্রয়াস, এই সন্দর্ভে বারংবার চেষ্টা করা হয়েছে। আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে, এই গবেষণাপত্রটি গুরুত্বপূর্ণ কিছু মৌলিক প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছে। তাই শুধু ওঁরাও জনজাতির প্রকৃত ইতিহাস অনুসন্ধানই নয়, আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চার একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচনের ক্ষেত্রেও, এই গবেষণাপত্রটি তাৎপর্যপূর্ণ। মূলত, মানভূম জেলায় স্থানান্তরিত ওঁরাও জনজাতির সমাজ, ধর্ম, সংস্কৃতি ও জীবন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, একটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠির ইতিহাস খোঁজার একটা প্রয়াস, এই সন্দর্ভে রয়েছে। ফলে, প্রান্তিক ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রেও, এই গবেষনাপত্রটি গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, ওঁরাও জনজাতির মানুষদের প্রসঙ্গে তেমন কোনো লিখিত কোনো উপাদান না পাওয়া যাওয়ায়, তাদের প্রকৃত ইতিহাস অনুসন্ধান করা অত্যন্ত কঠিন। এই প্রান্তিক মানুষদের ইতিহাস অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে, সেই সীমাবদ্ধতাকে মেনে নিয়েই, অনুসন্ধান করতে হবে। সরকারী নথিপত্রগুলিও, অনেক ক্ষেত্রে এ বিষয়ে নীরব। কিছু প্রথাগত, প্রচলিত রীতিনীতি, মৌখিক ভাষ্য এবং যৎসামান্য লিখিত উপাদানই এই ওঁরাও মানুষদের ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রে মূল হাতিয়ার। আশা করি, এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, ভবিষ্যতে এই প্রান্তিক মানুষদের ইতিহাস অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে, এই গবেষণাপত্রটি নতুন গবেষকদের কাছে সহায়ক হিসাবে বিবেচিত হবে।

গ্রন্থপঞ্জী

PRIMARY SOURCES

Beverley. A, Report on the Census of Bengal 1872 (Kolkata, 116-118)

Coupland, H : Manbhum District Gazetteers series, Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, 1911.

Datta, K.K, (ed) *Selection from the Judicial Records of Bhagalpur District Office*, 1772-1801, State central Record office, Patna, 1968.

Das, J.K. Report on Scheduled Tribes of Orissa, Part-V-B, Volume-XII, Orissa - Census 1961. Director of Census Operations, Orissa.1971.

Hotton. J. H. Census of India 1931,I II & III Volumes. Delhi, Gyan Publishing House, Reprint 1966.

Hunter. W. W, A Statistical Account of Bengal, Vol-17, Delhi 1976 (Reprinted)

Lokur B. N., The Report of the Advisory Committee on the Revision of the lists of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, Government of India Department of Social Security, New Delhi, 25th August, 1965.

Migration Report of 1924-1945, Employee Centre, Dumka.

OECD Country, (2001), "Organization for economic co-operation and development", Policy brief Our Common Future. Oxford University Press, Oxford. 1987

Roychaudhury P. C. Gazetteer of India. Bihar Superintendent Secretariat Press, Patna 1965.

Report of the Scheduled Areas and Scheduled Tribes Commission, 1960 vols I-II, ed. Verrier Elwin in A New Deal for Tribal India, (Ministry of Home affairs, New Delhi 1963

Interview of Gopal Orao of Niyamatpur, West Bengal 9th March 2018.

Interview of Lacchu Oraon of Barothol, West Bengal 15th February 2019.

JOURNAL

Daniel J. Rycroft. Looking Beyond the Present: The Historical Dynamics of Adivasi (Indigenous and Tribal) Assertions in India. Journal of Adivasi and Indigenous Studies 2014.

Gopa Majumder (Paul). The Oraons of Barasat : A Study on Some Aspects of Demography, Journal of Human Ecology, Volume 14, Haryana,2003.

Gupta Prakash, The Customary Laws of the Munda & the Oraon, *Journal of the Indian Law Institute*, Vol. 46, No. 1 (January-March 2004),

Joe K.W. Hill. Agriculture, Irrigation and Ecology in Adivasi Villages in Jharkhand: Why Control and Ownership over Natural Resources Matter. Journal of Adivasi and Indigenous Studies 2014.

Mukherji. Priyadarsi The Santal and Oraon Cosmogonic Myths and Certain Parallels in China: A Reflection of Socio-Cultural Realities. Vol. 36, No. 1/2, Indian Anthropological Association Jan-Dec 2006,

Virginius Xaxa. Oraons: Religions, Customs and Environment. India International center Quarterly. Vol.9. No. 2. 1992.

Sardar N., Kurukh kathatha Quarterly Oraon Culture and Literary Magazine, West Bengal, 2011.

SECONDARY SOURCES

BOOKS

Bose, A. (Ed.). Demography of Tribal Development. New Delhi: B. R. Publishing.1990.

Bhowmik. P. K. Re-thinking Tribal Culture in India. Kolkata: 2001.

Bakshi, S.R and Balak, Social and Economic Development of Scheduled Tribes, New Delhi. Deep and Deep Publications Pvt. Ltd.2000,

Bose. N. K, Tribal Life in India, National Book Trust, New Delhi.1977.

Campion, E. :My Oraon Culture. Ranchi, Jharkhand, India: Catholic Press.1980.

Chaudhuri. B, Tribal Transformation in India, Inter India Publications, New Delhi.1990.

Chaudhary. S. N, Tribal Development since Independence, Concept Publication Company, New Delhi.2009.

Chaube K. S, The Making and Working of the Indian Constitution, NBT, New Delhi, reprint 2010-11,

Dhan, R.O, These are my Tribesmen: the Oraons. Ranchi.1967.

Dalton, E. T. Descriptive Ethnology of Bengal, Government Printing Press. Calcutta.1872.

Das, S. T. :Tribal Development and Socio-Cultural Matrix. Delhi: Kanishka Publishers.1993.

Dube, S. C. (Ed).Tribal Heritage of India. Delhi: Vikash Publishing House.1977.

Das, S. T. Tribal Development and Socio-Cultural Matrix. Delhi: Kanishka Publishers.1993.

Das. S. T, Tribal Development and Socio-Cultural Matrix. Kanishka Publishers Distributors, Delhi.1993.

Doshi. S.L, Tribal Ethnicity and Class Integration, Rawat Publications, New Delhi, Jaipur.1990.

Deogaonkar. S. G, “Tribal Administration and Development, Concept Publishing Company, New Delhi.1994,

Elwin. V, Tribal world of Verrier Elwin,Oxford University Press.India,1964.

Elwin. V, A New Deal for Tribal India, Ministry of Home Affairs,1963.

Ekka. R, The Karam festival of the Oraon Tribal’s of India: a Socio-Religious analysis. Proceedings of ASBBS. Vol.16. No.1. Paper presented at 18th Annual Conference of American Society of Business and Behavioral Science, Los Vagas.2009.

Ekka, R, The Karam Festival of the Oraon Tribals of India: a Socio-Religious analysis. Proceedings of ASBBS. Vol.16. No.1. Paper presented at 18th Annual Conference of American Society of Business and Behavioral Science, Los Vagas,2009.

Fernandez. W, Indian Tribal’s and Search for an Indian identity. Social Change.1993.

Guha. R : Elementary Aspects of Peasant Insurgenary in Colonial India, OUP, 2nd impression 1994.

Ghosh. A, History and Culture of the Oraon Tribe: Some Aspects of Their Social Life, Mohit Publication, New Delhi, 2003.

Hutton, J. H. Caste in India, Oxford University Press. second edition Mumbai 1951.

Hunter, W.W, *The Annals of Rural Bengal* Hans eBooks Publishers, New York, 1868

Jain. P.C, Planned Development among Tribals, Prem Rawat for Rawat Publications, New Delhi.pp.1999.

Jones, Sir William. On the Chronology of the Hindus, an Article published in Asiatic Researches, Kolkata, Vol. II. 2006.

Kujur. A, The Oraon Habitat a Study in Cultural Geography. Ranchi: The Daughters of St. Anne.1989.

Kujur. J. M .& Minz. S. J (Eds.). Indigenous People of India Problems and Prospects. New Delhi: Indian Social Institute. 2007.

Kujur, J. M. Jharkhand: its Administration and Development. In N. Mahanti (Ed.), Small State Approach in Tribal Development: A Paradigm Shift Delhi: Inter India Publication.2005.

Kumar A. Tribal Culture and Economy, Inter India Publications, New Delhi.1986.

Khosla. J. N, Development Administration: New Dimensions, Indian Journal of Public Administration, Jan-March.1966.

Koonathan, V. P. The Religion of the Oraons: A comparative study of the concept of God in the Sarna Religion of the Oraons and the Christian concept of God. Shillong: Don Bosco Center for Indigenous Cultures.1999.

Mahapatra, L. K. Tribal Rights and Entitlements in land, Forest and Other Resources. Paper prepared for the UNDP Orissa Resettlement Policy Project. 2005.

Mathur. H. M, Tribal land issue in India: Communal management rights and displacement. In J. Perera (Ed.). Land and Cultural Survival: The communal land rights of indigenous people in Asia Philippines: Asian Development Bank.2009.

Mallick. A. Md, Development programs and tribal scenario: A study of Santhal, Kora and Oraon. Kolkata: Firma KLM Private Limited.2004.

Mehata. P. C, Ethnographic Atlas of Indian Tribes, Discovery Publishing House,New Delhi, reprinted 2013,

Mehta. O, Tribal Development: The New Strategy, Government of India, New Delhi.1976.

Mitra. P & Kakali, Development Programmes and Tribal Some Emerging Issues, Kalpaz Publications, Delhi.2004.

Mittal. A. C & Sharma. J. B, Tribal Education, Administration and Development, Volume-3, Radha Publication, New Delhi.1998.

Mallick, A. Md, Development Programs and Tribal scenario: A study of Santhal, Kora and Oraon. Kolkata, Firma KLM Private Limited.2004.

Malefijt, A. D. W, Religion and Culture: An Introduction to Anthropology of Religion, New York: The Mecmillan Company.1968.

Norbeck. E, Religion in Primitive Society, New York, Harper & Brothers,1974.

Minz, N. Jago Adivaasi Jago. In J. M. Kujur & S.J.Minz (Eds.) Pearls of indigenous wisdom, New Delhi: India Social Institute & Bangalore: Christian Institute for the Study of Religion and Society (CISRS).2007.

Pradhan. K. C. Tribal Development and Provisions of PESA. In S. N.Tripathy (Ed.), Rural Development and Social Change. New Delhi: Sonali Publications.2006.

Pandey, A. K, Tribal Society in India. New Delhi: Manak Publication Limited.1997.

Pant. B. R, Tribal Demography of India. New Delhi: Anamika Publishers & Distributors (P) Ltd.2004.

Patel. M. L, Planning and Strategy for Tribal Development, Inter-IndiaPublications, New Delhi.

Pati. R.N &. Jena. B, Tribal Development in India, Ashish Publishing House, New Delhi.1986.

Pereira, F. The Faith Tradition of the Kurukhar (Uraons), Delhi: Indian Society for Promoting Christian Knowledge.2007.

Pandey, R. B. (2005). Christianity and Tribes in India. Delhi: Academic Excellence.2005.

Panandiker. V. A. P, Development Administration: An Approach, Indian Journal of Public Administration,Jan-March.1964.

Roy S. C. The Oraons of Chhotanagpur, Abhijeet Publication New Delhi.1915.

Roy. S. C, Oraons of Chota Nagpur Their History, Economic Life and Social Organization, Crown Publication.Ranchi,2004.

Roy, S. C. Oroan Religion and Customs. Ranchi: K. M. Banerjee, Shyambazar, Calcutta.1928.

Singh, K. S. Status of Scheduled Tribes: Some Reflections on the Debate on the Indigenous People. Social Change.1993,

Singh. K. S, Transformation of tribal society: Integration vs. Assimilation. Economic and Political Weekly.Mumbai, , Vol. 17, No. 34, 1982.

Sahoo. R.K, Tribal Development in India, Mohit Publications, New Delhi.2005.

Selected Works of Jawaharlal Nehru/S Gopal ed. Vol. 8,

Shukla. R.S, “Forestry for Tribal Development”, Wheeler Publishing, ADivision of A.H. Wheeler and Co. Ltd., New Delhi.2000.

The Story of Anthropology from the Indian Viewpoint. Quoted in Sangeeta Dasgupta's The Journey of an Anthropologist in Chotanagpur, The Indian Economic and Social History Review New Delhi,2004

Toppo. S.R, Tribes of India. Indian Publishers Distributors. Delhi, 2000.

Thomas. K. Jhon, Human Rights of Tribals, Vol. 2, Isha Books, Delhi, 2005,

Thakur. D. Socio-Economic Development of Tribes in India, Deep and Deep Publishers, New Delhi.1986.

Thapar. R (Ed),Tribe, Caste and Religion in India. Delhi: Macmillan.1977.

Xaxa. V, State, society and tribes: issues in Post-Colonial India.: Pearson Education, New Delhi,.2008.

BENGALI BOOKS

বাস্কে ধীরেন্দ্রনাথ, সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাস, পার্ল পাবলিশার্স, কলকাতা-৬, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৮৮.

ভট্টাচার্য, তরুণদেব, পুরুলিয়া, ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৭৯,

রানা কুমার, রানা সন্তোষ, পশ্চিমবঙ্গে দলিত ও আদিবাসী, ক্যাম্প ২বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কোলকাতা, ২০০৯।

HINDI BOOKS

Bhagat N. Chhotanagpur Ke Oraon Reeti Riwaz. Jharkhand Jharokha, Ranchi, India.2013.

Khalkho. S, Oraon Shanskriti : Parivartan Evam Dishaya, Kudukh Vikash Shamiti, Ranchi.2009.

Panday. P. N.Gramin Vikas Avem Sanrachatmak Parivartan, Hindi Book Centre, New Delhi, India.2000.